:: প্রাক্‌কথন ::

সমগ্র জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং দার্জিলিং-এর সমতলভূমিকে পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চল নামে অভিহিত করা যায়। এই ভূভাগের সর্বোত্তরে রয়েছে সিকিম ও ভূটান, দক্ষিণে বাংলা দেশ, পশ্চিমে বিহার ও পূর্বে আসাম প্রদেশ। আলোচনার সুবিধার্থে উপরোক্ত সীমারেখাকে আমরা দক্ষিণ পশ্চিম, দক্ষিণপূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব এই চারিটি সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করে নেবার পক্ষপাতী। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের যে সমস্ত অঞ্চলে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক সংঘাত সমন্বয়। পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই সংঘাত ও সমন্বয় সর্বাপেক্ষা বেশী। চা বাগিচা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলের সংস্কৃতি দ্রুত রূপান্তরিত হয়েছে। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কুচবিহারের চা বাগিচা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু সেই সাঁওতালদের অনেককেই চা-শ্রমিক রূপে এতদঞ্চলে নিয়োগ করা হয়েছিল। 'তখনকার দিনে ছোটনাগপুর উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল হতে প্রধানতঃ তিন বৎসরের চুক্তিতে শ্রমিকদের আমদানী করা হত।'[১] এঁদের ভাষা যা অস্ট্রিক পরিবারের মুণ্ডারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত,[২] জীবজন্তু ও কৃষি সম্বন্ধীয় লোক বিশ্বাস, উৎসব, খেলাধূলা, গৃহনির্মাণ, সাজপোষাক, খাদ্য, বাদ্যযন্ত্র এতদঞ্চলের লোকচর্যায় যথেষ্ট পরিবর্তন বা রূপান্তর এনেছে।' অনুরূপভাবে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কুরুখ ভাষাভাষী ওঁরাওদের প্রভাবেও আলোচ্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি এবং কুরুখ ভাষার সমন্বয়ে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার চা বাগান অঞ্চলে 'সাদ্রি' ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এতদঞ্চলের প্রধান উপভাষা রাজবংশীতেও অসংখ্য প্রাদেশিক শব্দ যুক্ত হয়ে এই উপভাষা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই সমৃদ্ধির ধারা আজ ও অব্যাহত আছে।

বিগত দুটি মহাযুদ্ধ পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য কম দায়ী নয়। বিশ্বযুদ্ধ প্রথমে এনেছে গ্রামজীবন যাপনে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন পরে লোককৃতি, লোকযান লোকচর্যা অথবা লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষভাবে।

আলোচ্য অঞ্চলরে সংস্কৃতিতে নেপালী ও ভূটানীদের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে তা' অসমীয়া সংস্কৃতির মত এত ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ নয়। কারণ একসময় রত্নপীঠ বা

আসামের পশ্চিম ভাগ গোয়ালপাড়া , কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার সমন্বয়ে গঠিত ছিল।[৩] বস্তুতঃ অসমীয়া ভাষার সঙ্গে রাজবংশী কথ্য ভাষার যতখানি সাদৃশ্য রয়েছে মেচ, রাভা অথবা বোড়ো ভাষার সঙ্গে ততখানি নেই। অসখ্য অসমীয়া শব্দই শুধু নয়, প্রবাদ, প্রবচন, হিয়ালী, ধাঁধা বা ফাকরা, ছড়া ও সংগীত রাজ-বংশী উপভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মূলতঃ বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষা :- ১।রাঢ়ী (রাঢ় বা ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী মধ্য অঞ্চল, ২। ঝাড়খণ্ডী (প্রাচীন সুম্ম অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ, ৩।বরেন্দ্রী (উত্তর মধ্য বঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি) ৪। বঙ্গালী(পূর্ববঙ্গ) ৫। কামরূপী (উত্তর পূর্ববঙ্গ- শ্রীহট্ট-কাছাড় আদি অঞ্চল) - এদের মধ্যে পশ্চিম বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা গোটা উত্তরবঙ্গের মুখ্য উপভাষাটি - যাকে রাজবংশী বলা হয়, কোনো কোনো লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য খানিকটা মিলে গেলেও তাকে বরেন্দ্রী বা কামরূপী এই দুটি উপভাষার একটির মধ্যেও সঠিক বলা যায় না। কামরূপী উপভাষাকে অনেকে দুই অংশে ভাগ করেন।"এক অংশ পূর্ব কামরূপী ..... অপর অংশ পশ্চিম কামরূপী (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, পশ্চিম গোয়ালপাড়া, দার্জিলিং, সমতল, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব পূর্ণিয়া। এই পশ্চিম কামরূপী উপভাষাই আসলে রাজবংশী।"[৪]

কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং সমতলের সাংস্কৃতিক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে বারবার রংপুর ও গোয়ালপাড়া জেলার উল্লেখ করেছি। কারণ Cultural Belt কে গৌণ করে রাজনৈতিক সীমারেখাকে প্রাধান্য দিলে সংস্কৃতির আলোচনা যথার্থ হয় না। তাই আঞ্চলিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই রংপুর ও গোয়ালপাড়ার প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের প্রকল্প সমগ্র পশ্চিমবাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। তাই শুধুমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নয়, মেচ, রাভা, ঋষি, গিরি, বাকো, ভর ও মুণ্ডীদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা, আচার আচরণ প্রভৃতিকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি বলতে রাজবংশী সংস্কৃতি বোঝায় না; বোঝায় মিশ্র সংস্কৃতি; যা তিব্বত-চীন পরিবারের আসাম বর্মা গোষ্ঠীর বোড়ো ভাষা ভাষী মেচ এবং রাভা উপজাতির বহু সাংস্কৃতিক উপাদানে পরিপুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে ০.২৯ (শতকরা)ভাগ রাভা। ১৯৬১ সালের জনগণনায় জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলায় এঁদের সংখ্যা ছিল

যথাক্রমে ৪১৩২ ও ১৬০৮ । ১৯১১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে বসবাসকারী রাভাদের সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব একটি চার্টের সাহায্যে নীচে দেখানো হল ।[৫]

District	1961	1951	1941	1931	1921	1911
Jalpaiguri	4132	2869	2954	2076	-	722
Cooch Behar	1608	624	-	938	-	-

রাভাদের তুলনায় মেচ সংখ্যা গরিষ্ঠ । "একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় ১৩,১৭৮ জন মেচ পুরুষ-রমণী বসবাস করেন ।"[৬] রাভা এবং মেচ ব্যতীত যে সব আদিবাসী আলোচ্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারায় গৌণ অথবা অতিগৌণ প্রভাব বিস্তার করেছে তারা হল লেপচা, মাঘ, হাজং, ভুমিজ, মু, গারো, চাক্মা, ধুকুরা, ভুটিয়া, সেরপা, টোটো, মাল পাহাড়িয়া, নাগেশিয়া, কোরা, মাহালি, খেরিয়া, মুন্ডা, সাঁওতাল এবং ওঁরাও । কোচ, মেচ এবং কাছাড়ী — আদি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই আদিবাসীত্রয়ী এবং দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে রাজবংশী উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস । এঁরা শুধুমাত্র 'আদি মঙ্গোলীয়ান' বা 'দ্রাভিদিয়ান (Dravidian) গোষ্ঠীসম্ভূত নয় । কারণ রাজবংশীদের প্রত্যেকের শারীরিক গঠন মঙ্গোলীয় বা দ্রাবিড়দের মত নয় । এঁদের মধ্যে কারও 'দেহের রং পীতাভ, নাক চেপ্টা, চোখ গোল ও মুখমন্ডল শ্মশ্রু-গুম্ফ বিরল, আবার কারও দেহের রং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ অথবা শ্যামবর্ণ, নাকের দুটি পাটা নাতিস্ফীতোচ্চ, মস্তক কেশবহুল ও মুখমন্ডল শ্মশ্রুগুম্ফাচ্ছাদিত । এই রাজবংশীদের সংস্কৃতিকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি । দিতে হয়েছে এই কারণে যে শুধু মাত্র জলপাইগুড়ি, কুচবিহার কিংবা দার্জিলিং জেলার সমতল নয়, গোটা উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের সংখ্যা অন্যান্য আদিবাসী, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশী । এঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে 'কিরাত' ও 'নিষাদ' সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও হিন্দুর অসংখ্য সংস্কার মিশ্রিত হয়ে মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে । তাই শুধুমাত্র রাজবংশী সংস্কৃতি নাম না দিয়ে উক্ত সংস্কৃতির অঞ্চল ভিত্তিক নাম দিয়েছি 'পশ্চিম বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতি'।

মুস্লিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে মুস্লিম সমাজের কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান এতদঞ্চলের লোক সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এর ফলে ফকির টিপ, সৈৎ পীর, খোয়াজপীর প্রভৃতি হিন্দু মুস্লিম সংস্কৃতি সমন্বিত দেবতার জন্মলাভ ঘটেছে । আহার্যদ্রব্য প্রস্তুতের মধ্যেও মুস্লিম রন্ধন প্রণালীর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে ।

কৃষিনির্ভর সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল পশ্চিমবাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চল। অধিকাংশ আদিবাসী ও উপজাতির প্রধান উপজীবিকা হল কৃষি। অবশ্য জলবায়ু কৃষিকার্যের উপযোগী হলেও ২৪পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার তুলনায় জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং সমতলের মাটি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। দহলা, সহরা ও ডাঙ্গা — এই তিন শ্রেণীর জমির মধ্যে প্রথম দুটিতে ফসল ভাল হয়। ডাঙ্গা জমিতে জল দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং সূর্যের তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'খুটু' বা জমির খণ্ডিত অংশগুলি শুষ্ক হয়ে ওঠে। জলসেচের সুবন্দোবস্ত না থাকায় কৃষকদের এই সময় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যে বছর অনাবৃষ্টি বা 'শুখা' হয়, কেবলমাত্র সেই বছর বৃষ্টির প্রার্থনা জানিয়ে 'হুদোম দেও' পূজার ব্যবস্থা করা হয়।

সুতরাং যে অঞ্চলের সংস্কৃতি কৃষিভিত্তিক, সেখানকার কৃষির সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশ, শিল্পকলা, খাদ্যদ্রব্য, পশুপালন, দেবদেবী ও পূজাপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানের এক অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। তাই কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব প্রকল্পের প্রথমেই স্থান পেয়েছে।

কৃষিকর্ম প্রধান উপজীবিকা হলেও অনেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, মৎস্য ও পশুশিকার, বস্ত্রবয়ন, চা বাগানে কুলিগিরি, জনখাটা, মুনিষ বা কামলাগিরি এবং ক্ষেতমজুরী, করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র একটি উপজীবিকার উপর নির্ভর করে সংসার প্রতিপালন করা দুর্বিসহ বলেই আদিবাসী ও উপজাতিদের অনেকেই কৃষির উপর জোর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এতদঞ্চলের কৃষি কিছুটা উন্নত হয়েছে। কারণ শুধু শ্রমিক হিসেবেই নয়, সুদক্ষ চাষী হিসেবেও সাঁওতালদের যথেষ্ট নাম ডাক আছে।"সেই জন্য বর্ধমান, হুগলী ইত্যাদি অঞ্চলে এঁদের বেশকিছু সংখ্যককে চাষের সময় মেদিনপুর, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সাময়িক ভাবে ক্ষেতমজুরের কাজ করার জন্য নিয়ে আসা হয়।"[৮]

চা বাগিচা পত্তন ও সাঁওতাল আগমনের পূর্বে জলপাইগুড়ি কুচবিহার ও দার্জিলিং সমতলের চাষাবাদের ধরণ ছিল অনুন্নত। নিকটবর্তী রাজ্য সিকিম ভুটান ও নেপালের অধিবাসীরা কৃষিকর্মে তেমন দক্ষ না হওয়ায় উন্নত কৃষিপদ্ধতি এতদঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের অজানা ছিল। আসামের 'ঝুম' বা জুম পদ্ধতিতে চাষবাস এতদঞ্চলের কোথাও কোথাও অনুকৃত হলেও সে পদ্ধতি স্থায়িত্বলাভ করতে পারেনি। তাই গতানুগতিকভাবে লাঙ্গল ও বলদের সাহায্যে চাষ বংশপরম্পরায় এতদঞ্চলে চলে আসছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকেও কলের লাঙ্গলের ব্যবহার কৌশল রাজবংশী মেচ, ভর, গিরি, রাভা, চাকমা, হাজং ও ভূমিজদের কাছে প্রায় অজানা।

জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার সমতলভূমির বেশ কিছুটা অংশ গভীর অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ। হিমালয়েরপাদ সংলগ্ন হওয়ায় তরাইয়ের মত গভীর অরণ্য ও অতিবৃষ্টি এতদঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বর্ষাকালে এক নাগাড়ে তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত বারিপাতের ফলে পাহাড়িয়া নদীগুলি জলস্ফীতা হয়ে বন্যার কারণ হয়ে ওঠে। জীবন যাত্রা তখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ডুয়ার্স অঞ্চলে ~~জীবন~~ জীবনসংগ্রাম বৎসরের অন্যান্য ঋতুর তুলনায় বর্ষাকালে অত্যন্ত কঠিন। 'দুর্গম অরণ্য, অসমতল চারণভূমি, হিংস্র বন্য জন্তু পূর্ণ অরণ্যানী, নদনদীর ক্ষিপ্রধারা .... প্রকৃতির এই সকল প্রতিকূল অবস্থা "[১] অসংখ্য দেবদেবী ও অপদেবতার জন্ম দিয়েছে। তাদের তুষ্টি বিধানের জন্য পূজা, সেবা এবং মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাবিজ, কবচ, মাদুলি, ঢপ, শিকড় ও জড়িবুটি ধারণ করার প্রথা এবং পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকার নির্মাণ উপরোক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের বার বার সুদূর আয়ার্ল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় — যেখানে ইয়েটস্ এর মত কবিও ভূত, প্রেত, পিশাচ ও অপদেবতার প্রতি লোকের বিশ্বাস ও সংস্কারকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই পশ্চিমবাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভাওয়াইয়া, রংপাচাল, বিষহরার গান, সৈৎপীরের গান, মান পাঁচাল, রূপভান, সাগর ভাসা, বেনাকুশার গান, জাগের গান, প্রভৃতিতে বিরহভাব ও করুণ রসের এত প্রাধান্য। সংগীতের সুরে ~~সংগীতের সুরে~~ প্লুতস্বরের প্রাধান্যও এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

মৎস্য শিকার পদ্ধতিও পাহাড়িয়া নদীর উপযোগী। অধিকাংশ নদী নাব্য না হওয়ায় নৌ-চলাচলের যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। সেই কারণেই নৌকোর সাহায্যে মাছ ধরার পদ্ধতি তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা প্রভৃতি দু তিনটি নদী ছাড়া অন্যত্র বিরলদৃষ্ট। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনের পর মৎস্য শিকার পদ্ধতিতে পূর্ববঙ্গীয় রীতি পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। এই ভাবে আঞ্চলিক সংস্কৃতি মিশ্রসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের গতি অত্যন্ত দ্রুত। বর্তমানে মিশ্র সংস্কৃতির দুই বা ততোধিক ধারা এমনভাবে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে যাতে প্রত্যেক ধারার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গুলি খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং সমতলের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে আমরা প্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মার্জিত ও পরিশীলিত যুবসমাজের কাছ থেকে সে তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হইনি। প্রথমত: আদিবাসী ও উপজাতীয় যুবকেরা পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ

উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ, অতি-আধুনিকতার প্রতি তাঁদের প্রচণ্ড দুর্বলতা। তৃতীয়তঃ, অনুকরণ স্পৃহা তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এই কারণেই উপজীবিকার ক্ষেত্রে তারা কৃষির পরিবর্তে চাকুরীকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। ফলে তাঁদের দৃষ্টি গ্রামমুখী না হয়ে ক্রমশঃই শহরমুখী হয়ে উঠছে। কাজেই প্রাচীন ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি তাদের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমে আসাই স্বাভাবিক।

আমরা নিচে একটি তালিকা প্রস্তুত করলাম। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সাংস্কৃতি উপকরণের কোন্ গুলি অদ্যাবধি প্রচলিত, প্রায়লুপ্ত এবং পরিবর্জিত বা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান আলোচ্য অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে সংগৃহীত হয়েছে। পুরাতন যেখানে পরিবর্জিত ও নতুন যেখানে পরিগৃহীত হয়েছে সেখানকার প্রামাণ্য তথ্য আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শুধু যে পশ্চিম বাংলার উত্তরপূর্বাঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিবর্তন ধারায় এই ধরণের পরিসংখ্যানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য — এমন নয়, যে কোনো সংস্কৃতির অতিপ্রাচীন রূপ থেকে অতিআধুনিক রূপের পরিচয় তুলে ধরার সহায়ক হবে। শিল্পবিপ্লব ও পশ্চিমীদেশগুলির উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রাসী মনোভাবের ফলে শহর ও নগর পত্তনের ব্যবস্থা দ্রুত হয় এবং পশ্চিম বঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নগর জীবনের সঙ্গে গ্রামজীবনের যোগাযোগ অত্যন্ত সহজ হয়। এর ফলেই পরিবর্জন ও পরিগ্রহণের গতি পূর্বের তুলনায় অনেক দ্রুত হয়।

যেগুলি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি প্রচলিত :	যেগুলি বর্তমানে লুপ্ত-প্রায় :	যেগুলি বর্তমানে লুপ্ত	যেগুলি পরিগৃহীত
দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ :			
তুলসী, বটপাকিড়ী, শালশিরি, রোয়াগেড়া, সোহারী, ফকির চিপ, সন্ন্যাসী, গরাম ঠাকুর, খোয়াজপীর, তিস্তাবুড়ী, আলায় খুণ্ডী, বিষহরি, গোমাগুণা, হুদোম দেও, জ্বালা, দুয়ারনি ঠাকুর, রুটি পূজা, জন্মাষ্টমী, বলরাম, যাত্রা পূজা, উল্কাদান, গমীরা, চোরপূজা, খেরায়, থানসেবা, থানশিরি, হাট খুরণী, বাথো।	ফকির চিপ, গোমাগুণা, হুদোম-দেও, দুয়ারনি ঠাকুর, রুটি পূজা।	হাটঘুরণী।	দুর্গা, সরস্বতী, কালী, লক্ষ্মী, বাসন্তী।

শিল্পকলা :

মৃৎশিল্প, শোলা-শিল্প, পাটশিল্প, বেতশিল্প, বাঁশশিল্প, কুশ শিল্প ।	এন্ডিশিল্প, পাট-শিল্প ।	কুশশিল্প ।	দারুশিল্প ।

পোষাক পরিচ্ছদ :

লেংটি, বাখাল, আলখালা, চাদর, ডাঁজেবোনা খাটো ধুতি, ফতা বা পাতিন ।	আলখালা, লেংটি ।	ধকড়া ।	শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবী, ফুল প্যান্ট, আন্ডার-ওয়ার, জাঙ্গিয়া, গেঞ্জি, সাড়ী, ব্লাউজ, শায়া ।

অলংকার :

শাঁখা খাড়ু, সিকাহার, চন্দ্রহার, ঢুলকিমালা, বাখরাম, থাকনছিরি নাকছাবি, মাকড়ী, দোলক ।	শাঁখাখাড়ু, সিকাহার, চন্দ্রহার, ঢুলকিমালা, বাখ্রায়, থাকনছিঁড়ি ।	ঠেঙ্খাড়ু, মুঠাখাড়ু ।	নেকলেশ, কাঁচের চুড়ি আংটি, টিকলি, বাউটি, মটরমালা।

শিকার :

খরগোস, শিয়াল, মৎস্য, পাখী ।	শিয়াল ।	বুনো শুয়োর, বাঘ ।	X

বাদ্যযন্ত্র :

দোতরা, সারিন্দা, ঘোঙোয়োঙো, চিফুং, খাম, কুড়ুমুড়ু, তাল বা জুড়ি, মোখা, তাসি, ব্যানা ।	ব্যানা ।	টেংকি, ভোটতাল ।	হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, বেহালা, ঢোলক, ফ্লুট, কর্ণেট ।

সামাজিক আচার :

বিবাহ, গর্ভ ও প্রসব-কালীন স্ত্রীআচার, ভাতছোঁয়া, কানফিন্দা, সখাহালা, ভাদাভাদি, মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ।	সখাহালা, ভাদা-ভাদি ।	X	সাধভক্ষণ ।

লোকসাহিত্য :

ছড়া, ফাকরা, প্রবাদ, হিয়ালী, গ্রামের নাম-করণ সম্পর্কিতলোকশ্রুতি, গল্প, লোকসংস্কার ।	ছড়া, হিয়ালী ।	X	X

সঙ্গীত :

ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, নোটুয়া, জাগ, সৈৎ-পীরের গান, সোনা-রায়ের গান, মনশিখা, উদাসী, রসিয়া, পাখারের গান, রং-পাঁচালী, মদনকামের গান, বিষহরার গান, তিস্তাবুড়ীর গান, চৈৎপূজার গান, রূপভান, সাগর ভাষা ।	সোনারায়ের গান, রসিয়া, নোটুয়া।	কুশান গান, সাগরভাসা গান ।	কীর্তনাঙ্গের সুরে ভক্তি-মূলক সঙ্গীত, কৃষ্ণলীলার গান, রামমঙ্গল গান ।

পরিশেষে নিবেদন, পশ্চিমবাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোককৃতির অসংখ্য মূল্যবান সম্পদকে আমরা অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছি। সংগৃহীত তথ্যগুলি যাতে বিকৃতরূপ লাভ না করে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থিত করতে গিয়ে ব্যাকরণ দোষদুষ্ট গ্রাম্য ভাষাকে পরিমার্জিত করা হয়েছে। আমরা সেই এই পরিমার্জনা সযত্নে পরিহার করেছি। যা শুনেছি, প্রয়োজনবোধে শব্দগ্রাহক যন্ত্রে (Tape Recorcer) তা ধরে রেখেছি এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থে একাধিকবার শুনেছি ও সুনিশ্চিত হয়েছি। কখনও আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। যথাস্থানে সেই আলোকচিত্রগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া একই তথ্য একাধিক গ্রাম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে শুনে তার সত্যমূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থপঞ্জী

১। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ : পৃ: ২৯৩

২। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত) : পৃ: ১৭ ।

৩। রত্নপীঠত্ এভ্মুকি — অম্বিকা চরণ সরকার , পৃ: ১।

৪। উপভাষা প্রসঙ্গে — ড: হরিপদ চক্রবর্তী 'লোকশিল্প'— পাক্ষিক পত্রিকা) ১ম বর্ষ । ২য় সংখ্যা । আগস্ট ১৯৭৪ ।

৫। The Rabhas of West Bengal - A. K. Das and M. K. Raha P. 35

৬। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ : পৃ: ২০১।

৭। মুক্তিমুখে আদিবাসী : প্রতাপ গুহ , পৃ: ৪ ।

৮। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি : পৃ: ১৯ । লেখক- বিনয় ঘোষ ।

৯। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর (৪র্থ খণ্ড) : ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃ: ৫৬।

*****